আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ৫, সংখ্যা ২
মার্চ ২০০৮

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

প্রস্তাবিত কয়লা নীতি ও বাংলাদেশের জ্বালানী নিরাপত্তা

বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনরায় প্রস্তাবিত কয়লানীতি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেছেন যে, কয়লা উত্তোলনের পদ্ধতি কয়লানীতির নির্ধারণ করার বিষয় নয়, বরং এটা বিভিন্ন কয়লা খনির ভূতাত্ত্বিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তিনি ফুলবাড়িতে এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্পের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।[১] বর্তমানের খসড়া কয়লানীতিটি ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন কয়লানীতি পর্যালোচনা কমিটি বর্তমান সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য জমা দেয়। তবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন করলে দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়লা উৎপন্ন হবে যা কার্যত দেশের আভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহৃত না হয়ে বিদেশে রপ্তানী হবে। কারণ প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত কয়লাকে কোকে রূপান্তরিত করে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়েছে।[২] এটা দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানী নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করবে।

প্রস্তাবিত কয়লানীতির উল্লেখযোগ্য দিক:

- কয়লানীতি জাতীয় জ্বালানী নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

  যেহেতু দেশের বর্তমান কয়লার মজুদ দিয়ে আগামী ৫০ বছরের জ্বালানী নিরাপত্তা পূরণ সম্ভব নয় তাই কয়লা রপ্তানীর কোন সুযোগ নাই। (বর্তমানে দেশের ভূ-গর্ভস্থ কয়লার অনুমিত মোট মজুদ ৮৮৪ মিলিয়ন টন)

- কয়লাখনি উন্নয়নের পদ্ধতি (ভূ-গর্ভস্থ অথবা উন্মুক্ত) সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ বিপন্ন হতে পারে এমন কার্যক্রম পরিহার করতে হবে এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্থানীয় কমিটির মতামত নেয়া হবে।

- দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দেশের বার্ষিক চাহিদার মধ্যে সীমিত রাখা হবে।

- কোকিং কয়লা কোকে রূপান্তর করে দেশে ব্যবহার করা হবে। তবে দেশে এর পর্যাপ্ত ব্যবহার না থাকলে উদ্বৃত্ত কোক রপ্তানী করা যেতে পারে।

- প্রস্তাবিত কয়লা সেক্টর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার সময় সময় গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে ব্যবহৃত কয়লার রয়্যালিটি নির্ধারণ করবে।

চিত্র ১: বিভিন্ন জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

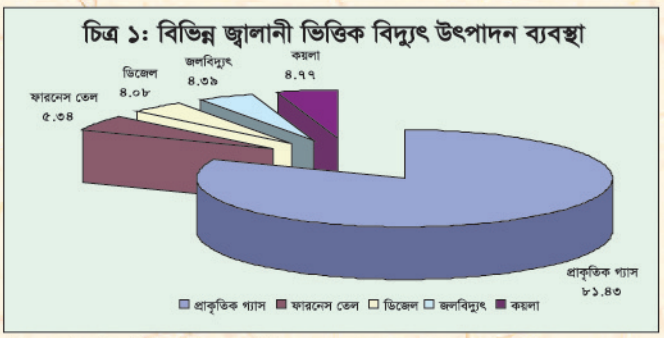

উৎস ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ২০০৮

ভবিষ্যৎ জ্বালানী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

বর্তমানে বাংলাদেশের জ্বালানী উৎপাদন ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলাতে পারছে না। ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩৪০০ মেগাওয়াট যার বিপরীতে চাহিদা ছিল ৫৩০০ মেগাওয়াট চাহিদার।[৩] অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। প্রাকৃতিক গ্যাস বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮১ ভাগ জ্বালানীর যোগান দেয় (চিত্র ১)। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বানিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রমানিত প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ৮.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) এবং সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ প্রায় ৫.৫ টিসিএফ।[৪] যদি নতুন কোন গ্যাসের মজুদ আবিস্কৃত না হয় তবে উল্লেখিত মজুদ যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৫ সালে নিঃশেষ হয়ে যাবে। বর্তমানে সকল গ্যাস ক্ষেত্রের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন প্রায় ১৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রতিদিন (Million Cubic Feet Per Day-এমসিএফডি) যেখানে প্রতিদিনের চাহিদা প্রায় ১৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট। অতএব দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন প্রতিদিন চাহিদার তুলনায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট কম হচ্ছে। এই উৎপাদন স্বল্পতার কারনে বর্তমান সরকার তার মধ্য ও সল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হতে মোট ১৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন নয়টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮% হয় তবে ২০১২ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রতিদিন ৯,২৮৮ মেগাওয়াট (অনুমিত উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ধরে)।[৫] ২০১৫ সালে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রতিদিন ১৩,০০০ মেগাওয়াট। ভবিষ্যতে এই চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার ২০১২ সাল নাগাদ ৬,২৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ৪৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এজন্য প্রয়োজন আরও ১,২৩৩ এমসিএফডি গ্যাস কিন্তু সরবরাহ স্বল্পতার জন্য মাত্র ৮৮৯ এমসিএফডি গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।[৬]

উন্নয়ন অন্বেষন
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি- ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org; ওয়েব: www.unnayan.org

সারণী ১ঃ বাংলাদেশের কয়লার মোট মজুদ

কয়লা খনির নাম ও অবস্থান	আবিষ্কারের সাল	গভীরতা (মিটার)	প্রমানিত ভূ-গর্ভস্থ মজুদ (মিলিয়ন টন)	প্রমানিত ও সম্ভাব্য ভূ-গর্ভস্থ মজুদ (মিলিয়ন টন)	অবস্থা
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	১৯৮৫-৮৭	১১৮-৫০৯	৩০৩	৩৯০	কয়লা উৎপাদন হচ্ছে
খালাসপীর, রংপুর	১৯৮৯-৯০	২৫৭-৪৮৩	১৪৩	৬৮৫	উন্নয়ন চলছে
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	১৯৯৭	১৫০-২৪০	২৮৮	৫৭২	উন্নয়ন চলছে
দীঘিপাড়া, দিনাজপুর	১৯৯৪-৯৫	৩২৮-৪০৭	১৫০	৬০০	সমীক্ষা চলছে
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	১৯৬২	৬৪০-১১৫৮		১০৫৩ (আনুমানিক)	উত্তোলনের জন্য অতিরিক্ত গভীর
সর্বমোট মজুদ (জামালগঞ্জ ব্যতিত)			৮৮৪	২২৪৭	

উৎস: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং পেট্রোবাংলা (ডিসেম্বর ২০০৭)

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় প্রধান জ্বালানী উৎস হলো খনিজ তেল। যা দ্বারা শতকরা প্রায় ৯.৫ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কিন্তু বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারনে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন খরচ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য সর্বোচ্চ ব্যারেল প্রতি ১০৯.৭২ মার্কিন ডলার যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।[৭] অন্যান্য প্রাকৃতিক জ্বালানী উৎসের ক্ষেত্রও বাংলাদেশে খুবই সীমিত। বর্তমানে জলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় প্রায় ২৩০ মেগাওয়াট (মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪.৩৯%)। বাংলাদেশের প্রায় সমতল ভূ- প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য যা আর বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সৌর ও বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমানে খুবই সীমিত এবং নিকট ভবিষ্যতে তা খুব বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেজন্য নিকট ভবিষ্যতে কয়লাই হবে অপেক্ষাকৃত সস্তা জ্বালানীর উৎস। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে ২০১৮ সালে ছাড়িয়ে যাবে (অনুমিত উচ্চ জিডিপি হার অনুসারে)। ২০১৮ সাল নাগাদ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৯,৯৭৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে যেখানে ৯৩৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হবে।[৮]

বাংলাদেশে কয়লার ভবিষ্যৎ চাহিদা

২০২৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা যদি অনুমদিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির নিম্নহার অনুসারে (প্রতিবছর ৫.২%) হবে ১৯,৩১২ মেগাওয়াট এবং তা অনুমিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অনুসারে (প্রতিবছর ৮%) হবে ৪১,৮৯৯ মেগাওয়াট।[৯] কিন্তু এই চাহিদা সামাল দেয়ার পর্যাপ্ত গ্যাস মজুদ বাংলাদেশের নেই। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী সংকট তীব্র হয়ে উঠবে। ২০২৫ সালের মোট ৪১,৮৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার ৩২,৮৩৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদন করার পরিকল্পনা রয়েছে (অনুমতি উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনুযায়ী) এজন্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের একারই ৪৪৯.৫ মিলিয়ন টন (৪৫০ মিলিয়ন টন) কয়লা প্রয়োজন। তারপর পরবর্তী বছর গুলোতে এই চাহিদা যদি ৩২,৮৩৭ মেগাওয়াটে স্থির থাকে তবে পরবর্তী ৫ বছরে অতিরিক্ত ৩৭৫ মিলিয়ন টন (প্রতি বছর ৫৭৫ মিলিয়ন টন) এবং পরবর্তী ১০ বছরে অতিরিক্ত ৭৫০ মিলিয়ন টন (১০৭৫ মিলিয়ন টন প্রতি বছরে) কয়লা প্রয়োজন হবে। এজন্য ২০৩০ এবং ২০৩৫ সাল নাগাদ কয়লার চাহিদা হবে যথাক্রমে প্রায় ৮২৫ এবং ১২০০ মিলিয়ন টন।[১০] অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান কয়লার মজুদ (৮৮৪ মিলিয়ন টন, সারণী ১) আগামী ২৫ বছরের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

চিত্র ২: ২০০৫-২০২৫ সালে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা

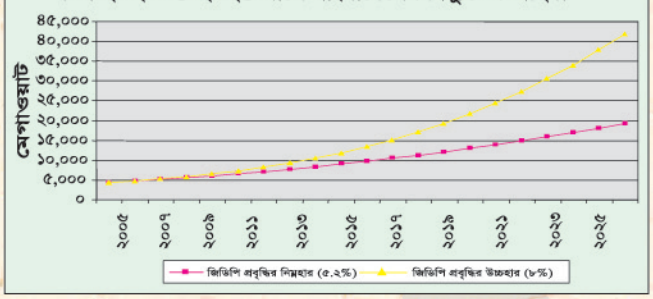

উৎস: বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

উন্মুক্ত কয়লা খনন পদ্ধতি -কার লাভের উদ্দেশ্যে?

কয়লা উৎপানের পাটিগনিত

প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে বলা হয়েছে যে, কয়লা উত্তোলন পদ্ধতির সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নেয়া হবে। এজন্য পরিক্ষামূলক সীমিতভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা প্রথমে একটি খনি থেকে উত্তোলন করা হবে।[১১] এ থেকে পরিবেশিক, সামাজিক এবং ভূতাত্ত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হবে। যদি পর্যবেক্ষণের ফলাফল অনুকূল হয় তবে এই পদ্ধতিতে অন্য কয়লা ক্ষেত্র, যেমন-ফুলবাড়ী, থেকে কয়লা উত্তোলন করা হবে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ইতিমধ্যে বলেছেন যে, কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি কয়লানীতির নির্ধারণ করে দেবার বিষয় নয় বরং কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি খনির বিভিন্নতা অনুসারে নির্ধারিত হবে।[১২] প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে অপেক্ষাকৃত অগভীর কয়লাক্ষেত্র বড়পুকুরিয়া এবং ফুলবাড়ি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা রয়েছে। সে অনুযায়ী সর্বমোট উত্তোলিত যোগ্য কয়লার পরিমাণ হবে ৬০৫ মিলিয়ন টন (যেখানে ভূ-গর্ভস্থ উত্তোলন যোগ্য কয়লার মজুদ ৮৮৪ মিলিয়ন টন)। এই পরিমান কয়লা ২০২৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম (সারনী২)। ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে সাধারনত তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যাহার করে কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব। মেকানাইজড বোর্ড পিলার পদ্ধতিতে ৪০-৫০% এবং ম্যানুয়্যাল বোর্ড পিলার পদ্ধতিতে ২৫% কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব। এই দুই পদ্ধতি ব্যবহার করে যথাক্রমে ৩৫৩-৪৪২ মিলিয়ন টন এবং ২২১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব। প্রথম পদ্ধতিতে ২০২৪-২০২৫ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানী চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে লঙ ওয়াল (Long Wall) পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ৬০-৭০% ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলন সম্ভব।[১৩] এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের বর্তমান মজুদ থেকে ৫৩১ মিলিয়ন কয়লা উত্তোলন করা হলে তা ২০২৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অতএব বোঝা যাচ্ছে উন্মুক্ত খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করলে মাত্র ২-৪ বছরের অতিরিক্ত জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চত করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মাত্র ২-৪ বছর অতিরিক্ত জ্বালানী নিরাপত্তার নিশ্চত করার জন্য কেন নীতিনির্ধারকরা পরিবেশ, আর্থ সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় অগ্রাহ্য করছেন। তদুপরি উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা উত্তোলন বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের কয়লার মজুদ খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার নিচের সমাহিত (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৯ জন)। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হলে বিপুল জনগোষ্ঠীকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এছাড়া উর্বর দুই ফসলী অথবা তিন ফসলী কৃষি জমি চিরতরে নষ্ট হবে। এখানে এশিয়া এনার্জি কর্তৃক (যুক্তরাজ্য ভিত্তিক খনিজ উত্তোলন কোম্পানী) ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রকল্প এলাকায় জরিপের কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের জরিপ অনুযায়ী প্রায় ১০,০০০ হেক্টর (পরবর্তীতে তা কমিয়ে ৬,০০০ হেক্টর করা হয়েছে) জমি ৩০ বছরে অধিগ্রহন করা প্রয়োজন হতো তাহলে এতে প্রায় ৫০,০০০ লোকের পুনর্বাসন দরকার হতো। এতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষি উৎপাদনসহ ছোট ও বড় ব্যবসা হারানোর ক্ষতি স্বীকার করতে হতো। এতে প্রতি বছর ঐ এলাকায় প্রাক্কলিত ক্ষতি হতো প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকা।[১৪]

চিত্র ৩: বিদ্যুৎখাতে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কয়লার ক্রমবর্ধমান চাহিদা

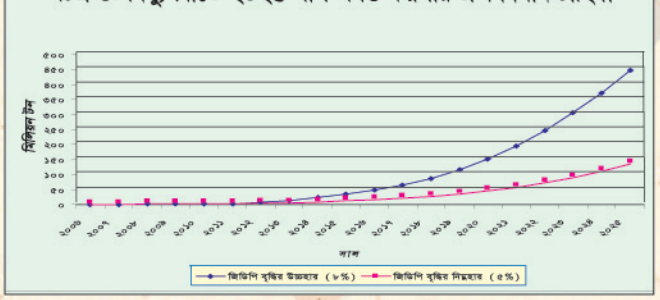

উৎস: বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

১৯৮৭-১৯৯১ সালে মেসার্স ওয়ারডেল এবং আর্মস্ট্রং নামক একটিযুক্তরাজ্য ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উপর একটি *feasibility study* পরিচালনা করে। সেই সীমানা অনুসারে বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ জলাধার থেকে বিপুল পরিমান পানি উত্তোলনের কারনে সৃষ্ট সমস্যার কথা উল্লেখ করে উন্মুক্ত কয়লা উত্তোলন পদ্ধতিতে নাকচ করে দেয়া হয়। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় খনি শুকনো রাখার জন্য ৩৪ বছর পর্যন্ত প্রতি সেকেন্ডে ৮,০০০-১০,০০০ লিটার পানি উত্তোলন প্রয়োজন হতো। এই বিপুল পরিমান পানি-অপসারন ঐ এলাকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়াও, সাম্প্রতিক সময়ে উন্মুক্ত উত্তোলন পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে পরিবেশের প্রতি হুমকি বিবেচনায় নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে, যেমন: হন্ডুরাস, আর্জেটিনা, ইকুয়েডর এবং কোষ্টারিকা। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্ল্যাসিয়াল ন্যাশনাল পার্ক এবং ঝর্নার ক্ষতি হওয়ার কারন দেখিয়ে মন্টানা অঙ্গরাজ্যের সীমান্তে কানাডার একটি উন্মুক্ত খনির বিরোধিতা করেছে।[১৫]

সারনী ২ ঃ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের উত্তোলন যোগ্য মোট কয়লার পরিমাণ।

কয়লাখনির নাম	মোট প্রমানিত ভূগর্ভস্থ	উত্তোলন যোগ্য মজুদ (মিলিয়ন টন)			
		প্রথম দুটি খনিতে উন্মুক্ত ও পরবর্তী দুটিতে ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে উত্তোলন করে *	ভূ-গর্ভস্থ লঙ ওয়াল (৬০%)	ভূ-গর্ভস্থ মেকানাইজড বোর্ড এবং পিলার (৪০-৫০)%	ভ-গর্ভস্থ ম্যানুয়াল গর্ভস্থ ম্যানুয়াল (২৫%)
বড়পুকুরিয়া	৩০৩	২৭৩ (৯০%)	১৮২	১২১-১৫১	৭৬
ফুলবাড়ি	২৮৮	২৫৯ (৯০%)	১৭৩	১১৫-১৪৪	৭২
খালাসপীর	১৪৩	৩৬ (২৫%)	৮৬	৫৭-৭২	৩৬
দীঘিপাড়া	১৫০	৩৭ (২৫%)	৯০	৬০-৭৫	৩৭
মোট উত্তোলন যোগ্য	৮৮৪	৬০৫	৫৩১	৩৫৩-৪৪২	২২১
জ্বালানী চাহিদা মেটানোর সময়		২০২৭ সাল	২০২৬ সাল	২০২৩-২০২৫ সাল	২০২১ সাল

উৎস: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং পেট্রোবাংলা (ডিসেম্বর ২০০৭)

* প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বড়পুকুরিয়া এবং ফুলবাড়ি কয়লা খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে এবং অপরদুটি কয়লা খনি থেকে ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কয়লা রপ্তানীই কি অতিরিক্ত উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য?

দৃশ্যতঃ প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে ৫০ বছরের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কয়লা রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তথাপি প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে কিছুটা ফাঁক রয়েছে যা কয়লা রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রস্তাবিত কয়লানীতির ৬.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোকিং কয়লা (উচ্চ তাপ উৎপাদনক্ষম কয়লা) দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হবে, তবে অতিরিক্ত উৎপাদিত কোকিং কয়লা কোকে রূপান্তরিত করে বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। যদিও প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে বলা হয়েছে কয়লা উৎপাদন দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদার মধ্যে সীমিত রাখা হবে কিন্তু যদি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হয় তবে উত্তোলনের প্রথম বছরগুলোতে কয়লা উৎপাদন আভ্যন্তরীন চাহিদাকে ব্যাপক ভাবে ছাড়িয়ে যাবে। এশিয়া এনার্জির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারকে ফুলবাড়ী কয়লা খনিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করে রপ্তানী করার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছে। তাদের দেয়া তথ্য অনুসারে তারা প্রতি বছর ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করবে।[১৬] কিন্তু কয়লার আভ্যন্তরীন চাহিদা ২০১৭ সালের আগে বার্ষিক ১৫ মিলিয়ন টন অতিক্রম করবে না (চিত্র-৪)। যদি অনুমিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার ধরেও চাহিদা বৃদ্ধি পায়, প্রাথমিক বছর গুলোতে আভ্যন্তরীন চাহিদা ৩ মিলিয়ন টনের বেশি হবে না। অতএব, শুধুমাত্র ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে বার্ষিক অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদিত হবে। এই বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত উৎপাদন শেষ পর্যন্ত নীতিনির্ধারকদের কয়লাকে কোকে রূপান্তর করে রপ্তানীর অনুমোদন দিতে বাধ্য করবে যা বর্তমানে সংকটপূর্ণ জ্বালানী নিরাপত্তাকে ভবিষ্যতে আরও হুমকির মুখে ফেলবে।

কয়লা উত্তোলন প্রকল্পগুলোতে বিপুল পরিমান বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। এজন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলন বিদেশী বহুজাতিক বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পছন্দ। যাদের মূল উদ্দেশ্য বিনিয়োগ থেকে দ্রুত মুনাফা করার জন্য সর্বোচ্চ পরিমান কয়লা উৎপাদন ও বিক্রি করা। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদিত কয়লার বাজার দেশের অভ্যন্তরে যদি না থাকে তবে তারা নীতি নির্ধারকদের কয়লাকে কোকে রূপান্তর করে রপ্তানি করার অনুমতি দেয়ার জন্য চাপ দিবে। এভাবে কোক রপ্তানির আড়ালে মূলতঃ কয়লাই রপ্তানি হবে।

চিত্র ৪: জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮% হারে কয়লার বার্ষিক অনুমিত চাহিদা

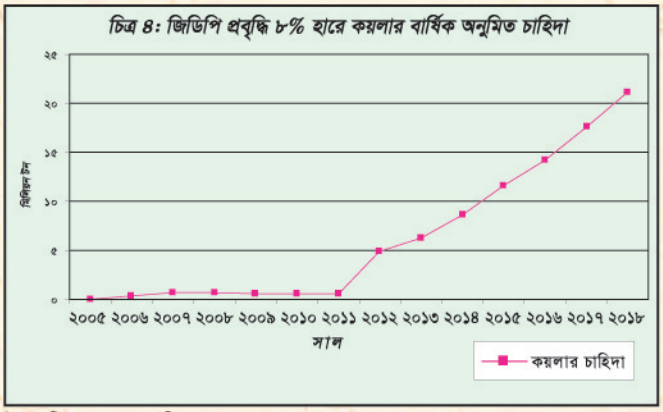

উৎস: বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

বিপন্ন সুন্দরবন

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলিত কয়লা যদি রপ্তানি করা হয় সেক্ষেত্রে যে প্রস্তাবিত রেললাইনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সরাসরি সুন্দরবনের উপর দিয়ে যাবে। ফলে সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি হবে। বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের জেলাগুলোর নিরাপত্তায় সুন্দরবনের অবদান আমরা অতিসম্প্রতি হয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর বেলায় পর্যবেক্ষণ করেছি। সুন্দরবনের কারনে 'সিডর' এর তান্ডব থেকে দনিাঞ্চলের অনেক অংশ রক্ষা পেয়েছে। তাই কয়লা রপ্তানির কারনে দণিাঞ্চলের জীবনযাত্রা বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী লাভের আশায় এভাবে দক্ষিণাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করা কোনমতেই সমীচিন নয়। এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় রেললাইন ও টার্মিনাল নির্মাণের ব্যয়ের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। এজন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ঋনসাহায্য দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু উৎকণ্ঠার বিষয় এমনিতেই বাংলাদেশ অতীতের 'উন্নয়ন ঋনের' ভারে জর্জরিত। প্রতিবছর ঘাটতি বাজেটের একটি বৃহৎ অংশ বৈদেশিক ঋনের দায় মেটাতে ব্যয় হয়। ২০০৫-০৬ সালে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ বাবদ ৯,৭৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল যা জিডিপির প্রায় ২.৩ শতাংশ।[১৭] তাই কয়লা রপ্তানির জন্য রেললাইন ও টার্মিনাল নির্মানের কারনে জমে ওঠা ঋনের বোঝা আরও বাড়বে। কয়লা রপ্তানির মতো দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কাজে বিদেশী কোম্পানীর লাভবৃদ্ধির জন্য দেশের ঋনের বোঝা বৃদ্ধি মোটেও যুক্তিসংগত নয়।

রয়্যালিটির কোন নিম্নহার বেঁধে দেয়া হয়নি

রয়্যালিটির বিষয়ে প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে কোন নিম্নহার বেধে দেয়া হযনি। এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, সরকার সময়ে সময়ে কয়লা সেক্টর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রয়্যালিটি হার নির্ধারণ করবে।[১৮] কিন্তু রয়্যালিটির নিম্নহার নিদির্ষ্ট না করে দেয়ার কারনে ভবিষ্যতে রয়্যালিটি হার নির্ধারনে দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হতে পারে। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিবেশী ভারতে উচ্চমানের কয়লার জন্য রয়্যালিটির হার খনি মুখে কয়লার মুল্যের ১৭.৪%। তদুপরি তাদের কয়লা সম্পদ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কোম্পানি "কোল ইন্ডিয়া" দ্বারা উত্তোলিত হয় এবং আভ্যন্তরীণ খাতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রয়্যালটি হারের তারতম্য দেশের সার্বিক লাভ ক্ষতিতে তেমন প্রভাব ফেলে না। এখানে সতর্ক করার বিষয় হচ্ছে যে, স্থির রয়্যালিটি হার দেশের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত করে যা কোম্পানির লাভ ক্ষতির উপর নির্ভরশীল নয়। সংস্থাগুলো সুচতুরভাবে হিসাবরক্ষন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন ব্যয় ও পরিচালনা খরচ বেশি দেখিয়ে লাভ কমিয়ে সরকারকে কম ট্যাক্স দিতে দক্ষ। যদি সরকার রয়্যালিটির হার কম নির্ধারণ করে কম্পানির লাভ থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স আদায়ের ইচ্ছা পোষণ

করে তবে শংকা থেকে যায় যে, সরকার প্রকৃত হার হতে কম হারে রাজস্ব পাবে। তাই দেশের স্বার্থ রার জন্য অবশ্যই রয়্যালিটির নিম্নহার যৌক্তিক হারে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত।

উপসংহার:

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের উৎপাদিত কয়লা কোনক্রমেই বিদেশে রপ্তানি করা উচিত নয় বরং সরকারের উচিত হবে কয়লাভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে কয়লার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এছাড়া দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রস্তাবিত কয়লাক্ষনীতে অবশ্যই রয়্যালিটির নিম্নহার বেঁধে দেয়া উচিত। কয়লানীতি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্যের আলোকে প্রণয়ন করা উচিত এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনকে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের উপর স্থান দেয়া উচিত।

টীকা ঃ

১. "Govt to form Another Committee to Review Coal Policy, Says Tamim: Citizen's Commission rejects idea, branding Tamim "controversial" in The New Age , February 28, 2008

২. স্বল্প সালফার সমৃদ্ধ বিটুমিনাস কয়লাকে (কোকিং কয়লা বলে পরিচিত) পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠিন কোকে রূপান্তর করা হয়। কোক উচ্চ তাপীয়গুনসম্পন্ন এবং ধাতু প্রক্রিয়া করণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

৩. www.bpdp.gov.bd, তারিখ : ১১ই মার্চ ২০০৮

৪. খসড়া কয়লানীতি , জুন ২০০৭

৫. বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

৬. "Gas crisis forces Govt to drop 9 power generation projects" in The Financial Express, February 24, 2008.

৭. "Oil prices near $110" in the Daily Star, March 12, 2008

৮. বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা, ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

৯. বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০০৬ সালে হালনাগাদকৃত

১০. খসড়া কয়লানীতি , জুন ২০০৭, এনেক্স ১

১১. "Draft Coal Policy Finalized" in New Age, December 15, 2007.

১২. "Govt to form Another Committee to Review Coal Policy, Says Tamim: Citizen's Commission rejects idea, branding Tamim "controversial" in The New Age , February 28, 2008

১৩. Coal Mining; en.wikipedia.org, date:March 11, 2008

১৪. আনু মুহাম্মদ, ২০০৫, 'ফুলবাড়ি কয়লা প্রকল্প: কার লাভ কার ক্ষতি', আনু ১৪. মুহাম্মদ, ২০০৬, উন্নয়নের রাজনীতি, সূচীপত্র, ঢাকা

১৫. আনু মুহাম্মদ, ২০০৮, "প্রতিক্রিয়া:উন্মুক্ত খনন: মানুষ ও কৃষি বিনাশী প্রস্তাবনা ", দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ই জানুয়ারী, ২০০৮

১৬. "Asia Energy links viability of Phulbari project to coal export" in The Financial Express, December 1, 2007

১৭. Economic Relation Division, 2007. Flow of enternal resources in Bangladesh 2005-06, GOB.

১৮. ১৯৬৮ সালে কয়লার রয়্যালটি ছিল ১০% কিন্তু ১৯৮৭ সালে তা বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়। ১৯৯৫ সালে তা পুনরায় উন্মুক্ত পদ্ধতির জন্য ৬% এবং ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির জন্য ৫% নির্ধরণ করা হয়। প্রস্তাবিত কয়লানীতির ৫ম সংস্করণে (জুন ২০০৭) রয়্যালটির হার ২০% নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতক্ষণ/IFI Watch, উন্নয়ন অন্বেষণ - দি ইনোভেটরস্ এর Economic Analysis Wing কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। Coal Policy and Concern over Future Energy Security of Bangladesh অবলম্ভনে চলতি সংখ্যাটি বাংলায় প্রস্তুত করেছেন এ এম ফয়সাল উদ্দীন। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বানিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ এর পক্ষে এটি প্রকাশ করেছেন এম নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব, উন্নয়ন অন্বেষণ।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণের ইংরেজি সংস্করণ পাওয়া যাবে: www.unnayan.org

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত।

নিজেরা করি
Nijera kori

The Nijera Kori is a continuous and diverse movement focusing on social mobilisation and ensuring accountable democratic structures, targeting the most marginalised groups through the development of autonomous landless organisations with an emphasis on gender equity.

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

The Unnayan Onneshan is a progressive think-tank that undertakes research for advancing ideas and building constituencies for social transformation. The Institute advances critical scholarship, promotes inter-disciplinary dialogue and amplifies grassroots perpectives. The public-interest research institute works in collaboration with national parters, international organisations and leading universities.

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি- ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org; ওয়েব: www.unnayan.org